কুইন মেরী ইউনিভার্সিটির গবেষণা

জেনোসাইড ইন মায়ানমার

কুইন মেরী ইউনিভার্সিটির গবেষণা

জেনোসাইড ইন মায়ানমার

অনুবাদ

হোসাইন আহমদ

জেনোসাইড ইন মায়ানমার

(লন্ডনের কুইন মেরী ইউনিভার্সিটির গবেষণা COUNTDOWN TO ANNIHILATION : GENOSIDE IN MYANMAR এর বাংলা অনুবাদ)

গবেষক
প্রফেসর পেনি গ্রীন, কুইন মেরী ইউনিভার্সিটি লন্ডন
ড. থমাস ম্যাকমানাস, কুইন মেরী ইউনিভার্সিটি লন্ডন
এলসিয়া ডি লা কোর ভেনিং, কুইন মেরী ইউনিভার্সিটি লন্ডন

অনুবাদ
হোসাইন আহমদ

অনুবাদ সহযোগী
মাসুক আহমদ সালীম ও আসআদ আহমদ

স্বত্ব : © International State Crime Initiative
প্রকাশকাল : ২০১৭

প্রকাশক : হোসাইন আহমদ
রেডব্রীজ, লন্ডন।
83hahmed@gmail.com

মুদ্রণ : আহরার মিডিয়া।
প্রচ্ছদ চিত্র : © Greg Constantine

COUNTDOWN TO ANNIHILATION: **GENOCIDE IN MYANMAR**
A Research report of International State Crime Initiative, School of Law, Queen Mary University of London. Supported by Economic & Social Research Council (ESRCN) and Queen Mary University of London (QUYL), Published in 2015.
Bangla Edition Published by Hussain Ahmed, Redbridge, London, for non-commercial and educational purposes

সূচি

ম্যাপ
শব্দ সংক্ষেপ
কালক্রম
Acknowledgements
ভূমিকা
সারসংক্ষেপ

প্রথম ভাগ: পরিচিতি ও পটভূমি

১. পরিচিতি ২০
জেনোসাইড : একটি ফ্রেমওয়ার্ক ২৩
মেথোডলোজি ২৬
২. পটভূমি ২৯
রাখাইন রাজ্য ২৯
রাখাইন নিপীড়ন ৩১
রাখাইন সুশীল সমাজ ৩৪
রাখাইন সংঘবদ্ধতা ৩৮
ইমার্জেন্সি কো-অর্ডিনেশন সেন্টার ৪২
বিক্ষোভ ৪৩
জাতিসংঘ এবং ইন্টারন্যাশনাল এনজিওদের ওপর হামলা ৪৫
রাখাইন জাতীয়তাবাদ ৪৬
২০১২ সালের সংঘাতের প্রভাব ৫৫

দ্বিতীয় ভাগ : জেনোসাইডের পথে

৩. স্টিগমাটাইজেশন ও ডিহিউম্যানাইজেশন	৬০
নাগরিকত্ব ও হোয়াইট কার্ড	৬৪
জেনোসাইডে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভূমিকা	৬৭
ঘৃণার প্রবক্তাগণ: ৯৬৯ ও মা বা থা	৬৯
৪. হয়রানি সহিংসতা ও সন্ত্রাস	৭৮
প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য	৭৯
ধর্ম ও বর্ণ আইন	৮১
সংঘবদ্ধ ম্যাসাকার: জুন ২০১২	৮৩
৫. আইসোলেশন ও পৃথককরণ	৮৯
ডিটেনশন ক্যাম্প	৯১
প্রিজন ভিলেজ	৯২
ঘিঞ্জি বস্তি : আং মিংগালার	৯৫
পৃথককরণের অন্যান্য প্রকাশ	১০২
৬. নিয়মতান্ত্রিকভাবে দুর্বল করা	১০৪
ডিটেনশনের অবস্থা	১০৪
স্বাস্থ্যসেবা প্রত্যাখ্যান	১০৭
খাদ্য সংকট	১১০
জীবিকার ক্ষতি	১১২
৭. উপসংহার	১১৩
তথ্যসূত্র	১১৭
BIBLIOGRAPHY	১৩০
LEAKED DOCUMENTS	১৩৩

ম্যাপ

সূত্র : দ্যা নিউ ইয়র্ক টাইমস

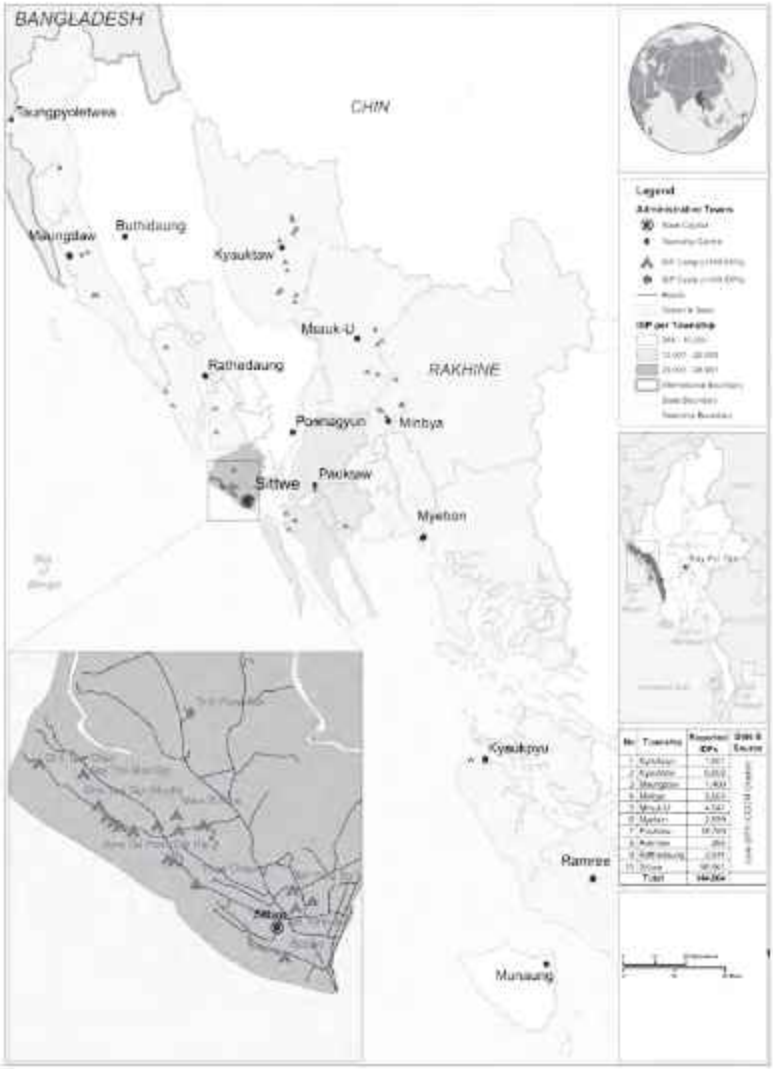

সূত্রঃ মায়ানমার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (MIMU)

শব্দ সংক্ষেপ:

969 : সংঘের অন্তর্গত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

AHRDO : আরাকান হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন।

ALD : আরাকান লীগ ফর ডেমোক্রেসি।

ANP : আরাকান ন্যাশনাল পার্টি ('রাখাইন ন্যাশনাল পার্টি' বলেও কোন সময় উল্লেখ করা হয়)

আরাকান : রাখাইন রাজ্য ও এর অধিবাসীদের পূর্ব নাম।

ASEAN : এসোসিয়েশন অব সাউথ ইষ্ট এশিয়ান ন্যাশনস।

বামার : মায়ানমারের সংখ্যাগুরু জাতিগোষ্ঠী, প্রায়শ তাদের 'বার্মিজ' ও 'বুর্মান' নামেও ডাকা হয়।

বার্মা : মায়ানমারের পূর্ব নাম (১৯৮৯ সালের পূর্বে)।

CSOs : সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনস।

ECC : ইমার্জেন্সি কো-অর্ডিন্যাশন সেন্টার।

ICRC : ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্যা রেড ক্রস।

IDPs : ইন্টারন্যালি ডিসপ্লেসড পারসনস।

INGOs : ইন্টারন্যাশনাল এনজিও

ISCI : ইন্টারন্যাশনাল ষ্টেইট ক্রাইম ইনিশাটিভ।

কালার : মুসলিমদের নিম্নবর্ণের বুঝাতে এই নামে ডাকা হয়।

কামান : রাখাইন রাজ্যের সংখ্যালঘু জাতিগত মুসলিম জনগোষ্ঠী।

ইয়াংগি-লী : মায়ানমারের হিউম্যান রাইটস সিচুএইশানের ওপর জাতিসংঘের স্পেশাল দূত।

মা-বা-থা : সংঘের অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

মায়ু ডিস্ট্রিক : উত্তরে রাখাইন রাজ্যের মংডু, বুচিডং ও রাদাডং ডিস্ট্রিক নিয়ে গঠিত।

MSF : মেডিসিনস সানস ফ্রন্টিয়ারস।

NGO : নন-গভার্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন।

NLD : ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি। আং সাং সুচির নেতৃত্বাধীন।

OHCHR : অফিস অফ দ্যা হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস।

OIC : অরগ্যানাইজেশন অফ ইসলামিক কান্ট্রিস।

থমাস অজি কুইনতানা : মায়ানমারে হিউম্যান রাইটস সিচুএইশানের ওপর জাতিসংঘের স্পেশাল দূত (২০০৮-১৪)

রাখাইন : রাখাইন রাজ্যে সংখ্যালঘু আদিবাসী বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী।

RNDP : রাখাইন ন্যাশনালিস্ট ডেভেলপমেন্ট পার্টি।

রোহিঙ্গা : রাখাইন রাজ্যে সংখ্যালঘু আদিবাসী মুসলিম জনগোষ্ঠী।
সংঘ : বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংগঠন।
SPDC : স্টেট পিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল।
টাতামাডাউ : মায়ানমার সেনাবাহিনী।
টাউনশিপ : শহরের প্রশাসনিক এলাকা।
ইউনিসেফ : জাতিসংঘের শিশু ফান্ড।
UNOCHA : ইউএন অফিস ফর দ্যা কো-অর্ডিনেশন অব হিউম্যানাটারিয়ান এফেয়ারস।
USDP : ইউনিয়ন সলিডারিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি। যার নেতৃত্ব দেন প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন।
WFP : ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম।
হোয়াইট কার্ড : সাময়িক আইডি কার্ড।

কালক্রম

১৭৮৫ : বার্মিজ রাজা বুদুপায়া কর্তৃক সর্বশেষ রাখাইন রাজ্য সংযুক্তিকরণ।

১৮২৪-২৬ : এংলো-বার্মিজ যুদ্ধ; আরাকান (রাখাইন) প্রদেশ বৃটিশ ইন্ডিয়ার সাথে সংযুক্তি।

১৯৪২-৩ : প্রো-বৃটিশ মুসলিম ও প্রো-জাপানিজ রাখাইনদের মধ্যে সংঘর্ষ; দু'দিকেই গণহত্যা সংঘটিত। মুসলিমদের উত্তর দিকে পলায়ন ও রাখাইনদের দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়া, যা পৃথককরণে সাহায্য করে।

১৯৪৮ : বৃটেনের কাছ থেকে বার্মার স্বাধীনতা লাভ। ইউ নু প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়া।

১৯৫৯ : বার্মার প্রথম প্রেসিডেন্ট সাউ শাউ থাইকির ঘোষণা, 'আরাকানের মুসলিমরা বার্মার বসবাসরত অন্যতম একটি আদিবাসী'।

১৯৬০ : রোহিঙ্গাদের ইলেকশনে ভোটদান।

১৯৬২ : নে উইন-এর নেতৃত্বে মিলিটারি ক্যু, যা এ্যাথনিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বৈষম্যের মাত্রা বাড়াতে সহায়তা করে।

১৯৭৪ : রাখাইনকে রাষ্ট্র হিসেবে মঞ্জুরি।

১৯৭৭-৭৮ : 'অবৈধ অভিবাসীদের' বিরুদ্ধে দেশজোড়ে ক্র্যাকডাউন; দুই লাখ রোহিঙ্গার বাংলাদেশে পলায়ন। পরের বছর অধিকাংশের বার্মায় প্রত্যাবর্তন।

১৯৮২ : সিটিজেনশিপ আইনে রোহিঙ্গাদেরকে দেশের ১৩৫টি জাতীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর তালিকা থেকে বাদ দেয়া এবং রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিল।

১৯৮৯ : বার্মার মায়ানমার নামকরণ; আরাকান রাজ্যকে রাখাইন রাজ্য হিসেবে ঘোষণা; মায়ানমারের জনগণকে নতুন সিটিজেনশিপ কার্ড প্রদান, তাতে অধিকাংশ রোহিঙ্গাকে বাদ দেয়া।

১৯৯০ : ইলেকশন অনুষ্ঠিত। রোহিঙ্গা ও কামান পার্টিগুলোর অংশগ্রহণ; বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা প্রতিনিধি নির্বাচিত।

১৯৯১-৯২ : পি থায়া নাম দিয়ে উত্তর রাখাইন রাজ্যে মিলিটারি অপারেশন; আড়াই লাখ মানুষের বাংলাদেশে পলায়ন।

১৯৯২ : উত্তর রাখাইন রাজ্যে নাসাকা মিলিটারি/বর্ডার ফোর্সের প্রতিষ্ঠা, যারা ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য কুখ্যাত।

১৯৯৩-৯৫ : রোহিঙ্গা যারা পি থায়া অপারেশনের সময় পালিয়ে গিয়েছিল UNHCR এর তত্ত্বাবধানে তাদের স্বদেশে পুনর্বাসন।

১৯৯৩ : সীমান্ত এলাকাগুলোর ইমিগ্রেশন কন্ট্রোলের দ্বারা মংডু জেলার রোহিঙ্গাদের বিবাহে বাধানিষেধ।

১৯৯৪ : মায়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের জন্মসনদ ইস্যু করা বন্ধ করে দেওয়া।

১৯৯৭ : সিতওয়ে জেলার প্রধান ইমিগ্রেশন অফিস রোহিঙ্গাদের তাদের জেলার বাইরে যেতে নিষিদ্ধ করে দেয়।

২০০১ : মংডু জেলা ও এর আশপাশের ২৮ টি মসজিদ ও মাদ্রাসা ধ্বংস।

২০০৫ : মংডু জেলার পিস ও ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল দ্বারা রোহিঙ্গাদের বিবাহ ও জন্মদানে বাধা নিষেধ আরোপ।

২০০৮ : রোহিঙ্গাদের সাময়িক রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রদান এবং ব্যাপকভাবে নিন্দিত মায়ানমার কন্সটিটিউশন রেফারেন্ডামে ভোট দেয়ার অনুমতি।

২০০৮-৯ : সরকার রোহিঙ্গাদের ঘর-বাড়ি স্পট-চেক শুরু করে ও তাদের চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা।

২০১০ : মায়ানমারে ইলেকশন, রোহিঙ্গাদের ভোটদানের অনুমতি।

২০১২ : রাখাইন রাজ্যে বৌদ্ধ ও মুসলিমদের মধ্যে সহিংসতার বিস্ফোরণ।

২০১৪ : মার্চ: সিতওয়েতে ইন্টারন্যাশনাল এনজিও অফিসগুলোতে রাখাইন ন্যাশনালিস্টদের হামলা; এপ্রিল: রোহিঙ্গাদেরকে এপ্রিলের জাতীয় আদমশুমারি থেকে বাদ দেয়া হয়।

২০১৫ : ফেব্রুয়ারি: পার্লামেন্ট সাময়িক হোয়াইট কার্ড বহনকারীদের (অধিকাংশ রোহিঙ্গা) পরিকল্পিত কন্সটিটিউশনাল এমেন্ডম্যান্টে ভোটদানের বিল পাশ করে। কিন্তু কয়েকদিন পরে প্রেসিডেন্ট এই সিদ্ধান্তকে রিভার্স করে ঘোষণা করেন হোয়াইট কার্ড অকার্যকর বা বাতিল; মে: আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে আন্দামান সমুদ্রে নৌকা সংকটের কথা উঠে আসে; জুন : UNHCR খাতিয়ান দেয় ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৫০,০০০ এর উপরে মানুষ মায়ানমার-বাংলাদেশ বর্ডার এরিয়া থেকে পালিয়েছে; আগষ্ট : উত্তর রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি ইউ শাউ মংকে পুনঃইলেকশনে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা।

Acknowledgements

This report was generously funded by the UK Economic and Social Research Council (ESRC), Queen Mary University of London (QMUL) School of Law and QMUL's Public Engagement Department.

We are very grateful for the invaluable assistance of Fatima Kanji, Francis Wade, Phil Rees, Al Jazeera, Tony Ward, Kristian Lasslett, Donna Guest, Maung Zarni, Tòmas Ojea Quintana, Louise Wise, 'Petrolhead', Greg Constantine, Mark Byrne, Valsamis Mitsilegas, Fortify Rights, Izzy Rhoads and Clare Fermont.

Many thanks, also, to the International State Crime Initiative interns; Valeria Matasci, Tally Abramavitch, Felix Cleverdon, Jessica Liu, Monica Dorligh, Shazni Hamim, Yukino Kawabata, Phil Reed and Adam Sutherland.

Special thanks to those who enabled our research inside Myanmar and who must remain anonymous for their own safety and security.

ভূমিকা

মায়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। দশকের পর দশক ধরে তারা নিপীড়নের শিকার। সরকারিভাবে তারা এতো ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী সীমালঙ্ঘনের শিকার যে, হোলিস্টিকালি বিবেচনা করলে এবং পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করলে একটি হিমশীতল বিবর্ণ ফল প্রকাশিত হয়।

এই উপসংহার কথার কথাও নয়, কিংবা কোনো শক্তির জোরেও বলা নয়। বিষয়টা গোপন রাখা হয়েছিলো বহুকাল, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বৈষম্য ও নিষ্ঠুর নীতির দ্বারা। এই নীতি দশকের পর দশক ধরে ঐতিহাসিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বলতে গেলে আসল ফ্যাক্ট হলো এই নীতি প্রবলভাবে ওঠানামা করেছে।

রোহিঙ্গাদের এই সংকটের সমাধানে ব্যর্থতার কারণ নিহিত মায়ানমারের রাজনীতি ও এর ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায়, যেখানে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত। এ ছাড়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও তাদের সহমর্মীদের প্রতি মায়ানমারের দুর্ভাগ্যজনক শত্রুতাও একটি কারণ। এমনকি যারা হিউম্যান রাইটস ভাইয়োলেইশনের ভিকটিম, তারাও।

যুগ যুগ ধরে চলে আসা মিলিটারি সরকারের কূটকৌশল ও কূটনীতিক মানিপুলেশন এই সংকটকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান রেখেই বলতে হচ্ছে, বর্তমান ব্যালেন্স সম্পূর্ণ নেগেটিভ। রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে টানা উদ্বেগ ও চিৎকার তাদেরকে নিপীড়নকারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পর্যাপ্ত নয়। এ ব্যাপারে কোন পর্যাপ্ত উপলব্ধিরও উপস্থিতি নেই, যেটা মায়ানমারে কোন মাত্রার কী ঘটে চলেছে, সে ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা দিতে পারে।

এই যখন অবস্থা, তখন আমরা আমলে নিয়েছি লন্ডনের কুইন ম্যারি ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল স্টেট ক্রাইম ইনিশাটিভ-এর গবেষণাকে। ড্যানিয়েল ফায়ারস্টাইন-এর বিশ্লেষণাত্মক ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট প্রমাণ করে রোহিঙ্গাদের নির্মূল করতে নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপকে। এবং তা একটি বিশ্বাসযোগ্য উপসংহারেও পৌঁছে যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চলছে একটি জেনোসাইড প্রক্রিয়া।

রোহিঙ্গা গ্রুপগুলোও জেনোসাইডের রিপোর্ট করে। কিন্তু ফ্যাক্ট হলো, অন্য খুব কম অর্গ্যানাইজেশনই সমান উপসংহার টানে। সন্দেহ নেই, এটা একটা সূক্ষ্ম বিষয় এবং এই ক্ষেত্রে যেহেতু মায়ানমারের রাজনৈতিক রূপান্তর জড়িত, তাই জেনোসাইডের ব্যাপারটা প্রকাশ করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য একটি লজ্জাজনক বিষয়। তা সত্ত্বেও এ রকম অনুসন্ধান কুইন ম্যারি ইউনিভার্সিটির এই রিপোর্টে আন্তর্জাতিক মৌলিক অধিকার লংঘনের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই অবস্থায় রোহিঙ্গাদের বর্তমান অবস্থাকে জেনোসাইড বিবেচনা করা ছাড়া উপায় নেই।

আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মায়ানমার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। আর এখন একটি জাতীয় ইলেকশন হতে যাচ্ছে, যা দেশটির ভবিষ্যতের জন্য ক্রিটিকাল। এখন একটি শান্তি প্রক্রিয়াও চলমান, কিছু হিউম্যান রাইটস ত্রুটি বিচ্যুতিও অতিক্রম করা গেছে, যদিও অধিকাংশই বিদ্যমান। কিন্তু রোহিঙ্গাদের দুর্ভাগ্যজনক সংকট দ্রুত বাড়ছেই। এই সম্প্রদায় এখন কোণঠাসা ও ভীতসন্ত্রস্ত, যা তাদেরকে চালিত করছে ভয়ংকর অবস্থা থেকে পালিয়ে খোলা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে, যেখানে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্ব বিবেকও নামমাত্র প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে।

আমরা যদি একজন রোহিঙ্গা মহিলার একটি মুহূর্তের অনুভূতি কল্পনা করতে পারতাম, আমাদের সভ্যতার আসল চেহারা দেখতে পেতাম : অস্তিত্ব অস্বীকার, বঞ্চনা, ক্ষুধা ও দারিদ্র, কারারুদ্ধ অবস্থা, ধর্ষণের ভীতি, নিপীড়ন ও হিংস্রতার শিকার হয়ে মৃত্যু। এই অবস্থার পরিবর্তনে তাদের জন্য আমাদের কাজ করা আইনগত ও নৈতিক কর্তব্য।

(থমাস ওজি কুইনতানা)

মায়ানমারে হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশনের ওপর জাতিসংঘের বিশেষ দূত (২০০৮-১৪)

সারসংক্ষেপ

২০১৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে খাদ্যহীন, খাবার পানিহীন, মাঝিবিহীন নৌকায় আটকা পড়া লোকজনের করুণ ছবি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল মায়ানমারের (বার্মার) রাখাইন রাজ্যের ১ দশমিক ১ মিলিয়ন আদিবাসী রোহিঙ্গা[১] মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি। এতদসত্ত্বেও মানবিক এই বিপর্যয় ঢেকে দেয় আরো গভীর সংকটকে। এই সংকট হল, তারা মায়ানমার[২] রাষ্ট্র কর্তৃক জেনোসাইড থেকে রক্ষা পেতে পালাচ্ছিল।

এই রিপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল স্টেইট ক্রাইম ইনিশাটিভ (ISCI) এর গবেষকদের উদ্বুদ্ধ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরকারের নির্যাতন ও ক্রাইমের মাত্রা জেনোসাইডের পর্যায়ের কি না, তা যাচাই করে দেখতে। আইএসসিআই-এর বিস্তারিত গবেষণায় অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, রোহিঙ্গারা হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, বিনা বিচারে আটক, ঘরবাড়ি ও গ্রাম ধ্বংস, জমি বাজেয়াপ্ত, জোর করে শ্রমিক বানানো, জাতীয় পরিচয় অস্বীকার, রোহিঙ্গা হিসাবে পরিচয় দিতে নিষেধাজ্ঞা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে নিষেধাজ্ঞা, স্বাধীনভাবে চলাফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি, রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মীয় ঘৃণার প্রচারণাসহ হাজারো অত্যাচারের শিকার।

গবেষণায় এটাও বেরিয়ে এসেছে যে, মায়ানমার রাষ্ট্র রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বিগত ত্রিশ বছর ধরে জেনোসাইড ও নির্যাতনের অসংখ্য নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রণয়ন করে আসছে। সাথে সাথে আলট্রা ন্যাশনালিস্ট রাখাইন ও উগ্র বর্ণবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনীসমূহকে এই জেনোসাইড সংঘটনের পথে সবধরণের সহযোগিতা করে আসছে।

নির্যাতন ও জেনোসাইড ২০১২ সালে এক ভয়াবহ ধাপে উন্নীত হয়। ওই বছর জুন মাসে গণহত্যায় ২০০-এর বেশি রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ ও শিশু মারা যায়। সহিংসতায় ৬০-এর বেশি রাখাইন নিহত হয়। ১০০-এর বেশি ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়, যার বেশির ভাগ রোহিঙ্গাদের। ওই সময় প্রায় ১ লাখ ৩৮ হাজার রোহিঙ্গা গৃহহীন হয়ে বন্দী শিবিরে আটক হয়।

এ ছাড়া আরো সাড়ে ৪ হাজার রোহিঙ্গা নিরুপায় অবস্থায় রাখাইন রাজ্যের রাজধানী সিতওয়ে'র ঘিঞ্জি বস্তিতে আশ্রয় নেয়।

রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মায়ানমার সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যমূলক নীতি ও তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কারণে সুযোগ সৃষ্টি হয় উস্কানিমূলক বক্তব্যের উত্থানে। সুযোগ হয় এসব ভাইয়োলেন্সের হোতাদের অব্যাহতি প্রদান ও ইসলামোফোবিয়ায় উৎসাহ প্রদানেরও।

ব্যাপক সহিংসতা ও বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সিস্টেম্যাটিক, পরিকল্পিত ও টার্গেট করে রোহিঙ্গাদের দুর্বল করা ছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ধারাবাহিক বৈষম্যমূলক আচরণ এবং নিপীড়নমূলক নীতির কারণে তা জেনোসাইডের ক্ষেত্র তৈরি ও তা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই জেনোসাইডের কর্মপদ্ধতি সৃষ্টি হয় ১৯৭০ সালে। সেটা আরো দ্রুত বৃদ্ধি পায় যখন মায়ানমার গণতন্ত্রের দিকে প্রত্যার্বতনে ব্যর্থ হয়।

এই রিপোর্টের প্রথম অংশে তুলে ধরা হয়েছে রোহিঙ্গাদের উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে চালানো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নির্যাতনের ইতিহাস। রিপোর্টে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে রাখাইন বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী ও সরকারের মধ্যকার বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারটা। দ্বিতীয় অংশে ডানিয়্যাল ফায়ারস্টাইন-এর জেনোসাইডের ছয় স্তরের বিবরণ অনুসারে এই নিপীড়ন প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান চালানো হয়েছে, যেভাবে তিনি তাঁর গ্রন্থে জেনোসাইডকে সামাজিক অনুশীলন[৩] হিসাবে দেখেছেন। আমরা এখানে প্রথম চার ধরণের জেনোসাইডের দিকে আলোকপাত করব, সেগুলো হল :

১. স্টিগমাটাইজেশন ও ডিহিউম্যানাইজেশন

২. হয়রানি, সহিংসতা ও আতঙ্ক সৃষ্টি

৩. আইসোলেশন ও পৃথক্করণ

৪. পদ্ধতিগতভাবে টার্গেটকৃত গোষ্ঠীকে দুর্বল করা।

এ ছাড়া নিয়মতান্ত্রিক দুর্বলীকরণ প্রক্রিয়া– যার সাথে যুক্ত রয়েছে ডিহিউমেনাইজেশান, সহিংসতা ও পৃথক্করণ নীতি। এটা এতটাই সফল হয়েছে যে, বলা যায় মায়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এমন মানুষে পরিণত হয়েছে যাদের কর্তৃত্ব কার্যকরভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। যারা সক্ষম, তারা পালাচ্ছে, অবশিষ্টরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগছে।

বর্তমানে রোহিঙ্গারা জেনোসাইডের সর্বশেষ দুই স্তরের সম্ভাব্য শিকার : গণহারে নির্মূল ও মায়ানমারের ইতিহাস থেকে তাদেরকে মুছে দেওয়া।

রিপোর্টটি জেনোসাইড ও তার ঐতিহাসিক সূচনা এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত প্রমাণাদি সংগ্রহ করেছে, যার সবগুলোই সংঘবদ্ধভাবে সংগঠিত হয়েছে। রিপোর্টটি জেনোসাইডের মূল হোতা বা নায়ক হিসেবে মায়ানমার রাষ্ট্রের কর্মকর্তাবৃন্দ, নিরাপত্তা বাহিনী, রাখাইন ন্যাশনালিস্ট সিভিল সোসাইটির নেতৃত্ব এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে শনাক্ত করেছে। সাথে সাথে মায়ানমারের রাজনৈতিক ভূখন্ড থেকে মুসলিম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে চিরতরে উচ্ছেদ করতে তাদের পরস্পরিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছে।

রিপোর্টটি বারো মাস মেয়াদকালের গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে চার মাসের অনুসন্ধান, যা ২০১৪ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৫ সালের

ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে অতিবাহিত করা হয়েছে। গবেষণাটিতে ১৭৬ টি ইন্টারভিউ, মাঠ পর্যায়ের অবজার্ভেশন ও ডকুমেন্টারি সূত্র সংযুক্ত হয়েছে।
রিপোর্টটির উপসংহার টেনে ISCI সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, মায়ানমারে জেনোসাইড সংগঠিত হচ্ছে। এবং রাষ্ট্রের মুসলিম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নির্মূলের[৪] ভয়াবহতা সম্পর্কে সর্তক করেছে।

প্রথম ভাগ: পরিচিতি ও পটভূমি

রোহিঙ্গা শিশু; সিতওয়ের দারপিং ক্যাম্প, নভেম্বর ২০১৪

১. পরিচিতি

২০১২ সালে, মায়ানমারে সিভিল সোসাইটি রেসিস্ট্যান্স ও রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও দুর্নীতি নিয়ে গবেষণাকালে আইএসসিআই (ISCI)-এর চোখে পড়ে উত্তর-পশ্চিম মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে মুসলিমদের উপর রাষ্ট্র অনুমোদিত ব্যাপক সহিংসতা ও বৈষম্যের রিপোর্ট। ওই বছর যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, সেটা শুধুমাত্র সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি আন্তঃসাম্প্রদায়িক সহিংসতার ফসল ছিল না, বরং সেটা ছিল কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার কর্তৃক নেয়া দীর্ঘমেয়াদী একটি স্ট্র্যাটেজির অংশ। যাতে নিপীড়নের শিকার সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবিক জগত থেকে অপসারণ করা যায়।[৫]

এই স্ট্রাটেজির উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে– ১৯৮২ সালে রোহিঙ্গাদের অফিসিয়ালি স্বীকৃত সংখ্যালঘু তালিকা থেকে বাদ দেয়া ও নাগরিকত্ব

কেড়ে নেয়া; ১৯৯৪ সাল থেকে রোহিঙ্গা শিশু সন্তানদের জন্মসনদ ইস্যুকরণ প্রত্যাখ্যান; এমনকি 'রোহিঙ্গা' টার্ম ব্যবহারে সরকারের অস্বীকৃতি এবং যেসব গোষ্ঠী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এই টার্ম ব্যবহার করে, তাদের প্রতি নিন্দা প্রদর্শন; ২০১৪ সালে আদমশুমারী থেকে রোহিঙ্গাদের বাদ দেওয়া; ২০১৫ সালের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা, চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে বাধা, চাকুরীর সুবিধা ভোগ ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উপর দীর্ঘমেয়াদী নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

মায়ানমারের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃগোষ্ঠীয় বিবাদের। রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও নিপীড়নের। জনগণের চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা এবং অনুন্নয়নের। ধর্মীয়ভাবে মায়ানমারের বৈচিত্র্য থাকলেও সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই।[৬] দেশটির রাখাইন ও রোহিঙ্গাসহ জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও নিপীড়নের কালো অধ্যায় আছে, তবে নির্দিষ্টভাবে রোহিঙ্গাদেরকেই ভয়াবহ নিপীড়নের জন্য বিশেষভাবে বেছে নেয়া হয়েছে। যার ফলে রাখাইন রাজ্যে বৌদ্ধ ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা পাল্টে গিয়ে প্রকাশ্য শত্রুতায় রূপ নিয়েছে। আর এই শত্রুতার প্রকাশ ঘটছে প্রাথমিকভাবে রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি রাখাইন ও বামার (বার্মিজ)[৭] বৌদ্ধদের মাধ্যমে।

রাখাইন রাজ্য দারিদ্র্যের দিক দিয়ে মায়ানমারে দ্বিতীয় স্থানে। অর্থনৈতিক ও উন্নয়নের বহু বছরের অবহেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে এই এলাকার। রাখাইন, রোহিঙ্গাসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী এ রাজ্যে বাস করে আসছে চূড়ান্ত দারিদ্রের মধ্য দিয়ে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা-বঞ্চিত জাতি হিসাবে। ফলশ্রুতিতে রাখাইনদের ভিতরে মায়ানমার রাষ্ট্র ও শাসকগোষ্ঠী– বামারদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। তাদের ক্ষোভ বলির পাঠা রোহিঙ্গা বা 'অবৈধ বাঙালি ইমিগ্রান্ট'দের প্রতিও (সরকার ও কিছু পাবলিক রোহিঙ্গাদেরকে এই তকমা দিতে চায়)। এমনকি রাখাইনদের ক্ষোভের পরিধি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিও বিস্তৃত, যাদের ব্যাপারে তারা মনে করে এসব অর্গানাইজেশন রোহিঙ্গাদের প্রতি তুলনামূলক বেশি সহমর্মী।

রাখাইন কমিউনিটি সদস্যদের সাথে দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন এবং সরকার কর্তৃক রাখাইন কালচার অবদমন সম্পর্কিত ইন্টারভিউ নেওয়ার কালে ISCI এর কাছে অনেকে কিছু ব্যাপারে ভয় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই ভয়ই তাদেরকে চালিত করেছে মুসলিমদেরকে সম্ভাব্য থ্রেট হিসেবে ভাবতে। আইএসসিআই-এর গবেষণা বলে দেয়, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বৈষম্যমূলক নীতির প্রতি রাখাইনদের ক্ষোভকে পাল্টে দিতে সরকার ও তার স্পন্সরড অভিনেতারা রাখাইনদের বৈধ ইস্যুকে রোহিঙ্গাদের প্রতি বৈরী আচরণে পরিবর্তন করতে মানিপুলেট করেছে। আর এই

বলির পাঠা বানানোর প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় কুশীলবের ভূমিকায় রয়েছেন সরকারের কর্তারা, ন্যাশন্যালিস্ট রাখাইন পলিটিশিয়ান, সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং উগ্র বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। যার ফল দাঁড়িয়েছে বর্ণবাদ, জেনোফোবিয়া ও ইসলামোফোবিয়ার ভয়ংকর মিশ্রণ। যা রোহিঙ্গাদের ডিহিউম্যানাইজ করে, এবং তাদেরকে খারিজ করে দেয় রাখাইন ও মায়ানমারের 'নৈতিক কর্তব্যের দুনিয়া'[৮] থেকে।

রাখাইন রাজ্যে ২০১২ সালের জুন ও জুলাইয়ে যে সহিংসতা হয়েছিল, তাতে প্রায় ১ লাখ ৪৭ হাজার লোক গৃহহীন হয়। যাদের মধ্যে ১ লাখ ৩৮ হাজার জন রোহিঙ্গা। এদের অধিকাংশই আজ সিতওয়ের উপকণ্ঠে মানবেতর জীবনযাপন করছে, যা মূলত একটি দুর্বেধ্য বন্দিশালা। বাকিরা সিতওয়ে, পাউক টাউ, ম্রাউক ইউ, মিনবয়া এবং মাইবন[৯] এলাকা ও এর আশপাশের গ্রাম ও ক্যাম্পে আরো আইসোলেটেডভাবে বসবাস করছে। সিতওয়ের এক সময়কার ব্যস্ততম এলাকার একটি ঘিঞ্জি বস্তিতে (Aung Mingalar) শহরের অবশিষ্ট ৪৫০০ রোহিঙ্গাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এক সময়কার তিনটি মনমুগ্ধকর মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া ২০১২ সালের সহিংসতায় মুসলিম জনজীবনের সকল চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছে। উত্তর রাখাইনে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত জেলা বুথিডং ও মংডুতে স্পেশাল পারমিশন ছাড়া প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এলাকাটি একটি সংরক্ষিত এলাকা, যেখানে রোহিঙ্গারা কঠোর বাধানিষেধের মধ্যে বেঁচে আছে।

২০১৩ ও ২০১৪ সালের পুরোটা জুড়েই রাখাইন রাজ্যে গৃহহীন ও আইসোলেটেড রোহিঙ্গা ও ক্ষুদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী কামানদের[১০] অবস্থার অবনতি হয়েছে। ২০১৩ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান (UNOCHA) এক রির্পোট প্রকাশ করে যে, রাখাইন কমিউনিটির লোকজন বিভিন্ন রিমোট গ্রামগুলোতে কমপক্ষে ৩৬০০০ রোহিঙ্গাদের কাছে মানবিক সাহায্য পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে।[১১]

রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, রোহিঙ্গাদের আশ্রয়শিবির ত্যাগ করার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমনকি মায়ানমার সিকিউরিটি ফোর্স কর্তৃক হত্যার প্রমাণও রয়েছে।[১২]

মায়ানমারে হিউম্যান রাইটসের ওপর জাতিসংঘের তখনকার বিশেষ দূত থমাস ওজি কুইনতানা জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন :

...মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার ওপর অসম ও বৈষম্যমূলক বিধিনিষেধ বিদ্যমান থাকায় এটা বিরাট প্রভাব ফেলছে তাদের মানবাধিকারসহ স্বাভাবিক জীবনযাপন, খাদ্য, পানি ও স্যানিটেশন, স্বাস্থসেবা ও শিক্ষার ওপর।[১৩]

সাহায্য প্রদানকারী একটি সংস্থার সাথে কর্মরত একজন ব্যক্তি রিপোর্ট করেন যে, জীবন ধারণের মৌলিক সরঞ্জামাদির অভাবে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তাদেরকে 'অপরিহার্য মৃত্যুর' দিকে নিয়ে যাচ্ছে।[১৪]

২০১৪ সালের নভেম্বরে UNOCHA রিপোর্ট পেশ করে যে, ১ লাখ ৩৮ হাজার রোহিঙ্গা ও কামান বাস্তুচ্যুত রয়েছে।[১৫] আরো প্রায় দশ লক্ষ অষ্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সউদি আরব, এবং যুক্তরাজ্যে বসবাস করছে এবং কাজকর্ম করছে কিংবা ক্যাম্পগুলোতে অন্তরীণ আছে।

UNOCHA এর হিসাব অনুযায়ী জানুয়ারি ২০১২ ও জুন ২০১৫ এর মধ্যে ১ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি লোক মায়ানমার বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে পলায়ন করেছে।[১৬] এসব বিপজ্জনক পথযাত্রায় প্রায়ই তাদের সাগরে ডুবে মৃত্যু হয় ও স্মাগলারদের দ্বারা তারা এবিউসের শিকার হয়।[১৭]

নাগরিকত্ব অস্বীকার, চাকুরী সুবিধা বঞ্চিত, স্বাস্থ্যসেবা ও পর্যাপ্ত খাদ্য বঞ্চিত; আইন ও নীতি বৈষম্য; ক্যাম্প ও ঘিঞ্জি বস্তিতে বন্দিদশা; নির্যাতন ও চাঁদাবাজির শিকার হওয়া এবং প্রতিদিন হত্যাযজ্ঞের হুমকি নিয়ে জীবনযাপন করা– রোহিঙ্গাদের অস্তিত্বই এখন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

জেনোসাইড : একটি ফ্রেমওয়ার্ক

রাষ্ট্রীয় ক্রাইম সংঘটিত হয় রাষ্ট্রের সাংগঠনিক লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে। যার মধ্যে হিউম্যান রাইটস ভাইয়োলেইশনও রয়েছে। এটা সরকারের প্রতিনিধির মাধ্যমে সংঘটিত হয়।[১৮]

জেনোসাইড একটি নির্দিষ্ট ধরনের রাষ্ট্রীয় ক্রাইম, যার কার্যক্রম সামাজিকভাবেও চলে। যেমন ফায়ারস্টাইন ব্যাখ্যা করেছেন : এর লক্ষ্যে থাকে '(১) অটোনোমি ও কো-অপারেশনের উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক ধ্বংস করে দেয়া; (২) বেঁচে যাওয়া লোকদের মধ্যে নতুন এক পরিচিতি ও সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে– এই ভীতিকে ব্যবহার করা'।[১৯]

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এই ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় সংঘটিত জেনোসাইড হল একটি প্রক্রিয়া, যা প্রায়ই চলে কয়েক বছর সময়কাল ধরে, এমনকি কয়েক যুগ ধরে। এটা স্বতন্ত্র্যভাবে শুধুমাত্র শারীরিক ধ্বংসকে বুঝায় না। এই পন্থাকেই সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করেছেন পোলিশ আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ রাফায়েল লেমকিন :

'সাধারণভাবে জেনোসাইড বলতে তাৎক্ষণিক কোন জাতিকে ধ্বংস করাকে বুঝায় না, তবে যদি তা সম্পন্ন করা হয় একটি জাতির সকল সদস্যকে হত্যার মাধ্যমে, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। এর উদ্দেশ্য থাকে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতিতে একটি সমন্বয়ক

পরিকল্পনাকে সিগনিফাই করার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীর জীবনের অপরিহার্য বুনিয়াদকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া। যার আসল উদ্দেশ্য থাকে সেই জনগোষ্ঠীকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এ ধরনের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য জাতীয় জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সংস্কৃতি থেকে, ভাষা, ধর্ম ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে আলাদা করে দেয়া। এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য, সম্মান এমনকি এসব জনগোষ্ঠীর সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়া।'[২০]

এই রিপোর্ট রোহিঙ্গাদের পরিচিতি মুছে দিতে মায়ানমার সরকার কর্তৃক নেয়া অসংখ্য স্ট্রাটেজির প্রমাণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছে। আর এটা করতে গিয়ে রিপোর্টটি উন্মোচন করে দিয়েছে স্ট্রাটেজির রচয়িতা, বাস্তবায়নকারী ও সহায়োগীদের চেহারা।

গণসহিংসতা, জোরপূর্বক আইসোলেশন, ভোটের অধিকার বঞ্চিত, অস্বাস্থ্য ও খাদ্যহীনতার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের সিস্টেম্যাটিক ও টার্গেট করে দুর্বল করা এবং শাসকগোষ্ঠীর পক্ষপাতমূলক ও নিপীড়নমূলক পলিসি এমন মাত্রায় পৌছে গিয়েছিল যে, যা মং জারনি ও এলিস কাওলি (Maung Zarni Alice Cowley) ব্যাখ্যা করেছেন 'স্লো বার্নিং ডেথ' হিসেবে'।[২১]

বাদ দেওয়ার মতাদর্শের (exclusionary ideology) প্রস্তুতি ও অঙ্গীকার ব্যতীত জেনোসাইড সংঘটন সম্ভব নয়। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল জনগণের কাছ থেকে এমন কাজের সম্মতি অর্জন করা, যে কাজ পরবর্তীতে রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করবে।[২২] বাদ দেওয়ার এই মতাদর্শ অপরাধীদের মনে ভিকটিমদেরকে (ডিহিউম্যানাইজ) মানবিক স্তর থেকে নিচে নামিয়ে দেয়।[২৩] যা অপরাধীদের ধ্বংসযজ্ঞের সাথে ভিকটিমদের খাপ খাইয়ে নিতে কাজ করে। ভিকটিমকে মানবিক স্তর থেকে নিচে ফেলে দেওয়া (ডিহিউম্যানাইজ) খুবই প্রয়োজন, কারণ জেনোসাইডের একটি পলিসি, যা জনগণের সাপোর্ট ও অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে। যদি টার্গেট দলটি মানুষ না হয়, তবে তাদের হত্যা নরহত্যা (murder) নয়।[২৪]

একসময় যখন টার্গেটকৃত দলটি আলাদা ও শনাক্তযোগ্য হয়ে ওঠে; 'আমাদের' ও 'তাদের' মধ্যকার পার্থক্য কার্যকর হয়ে ওঠে, তখন এই দুষ্কর্মে জনগণের সহযোগিতা পেতে সরকার ডিহিউম্যানাইজেশনের অন্যান্য কৌশল ব্যবহার করে। যেমন অপপ্রচার, বলপ্রয়োগ এবং সন্ত্রাস ইত্যাদি। সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের মধ্যে হাই লেভেলের কো-অপারেশনের সাথে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, যেহেতু জেনোসাইডের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল স্থানীয় সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা।[২৫]

ডিহিউম্যানাইজেশনের প্রক্রিয়া, সাথে সাথে অপপ্রচার, ক্ষোভ, অস্থিরতা ও উত্তেজনার ব্যবহার– এগুলোই ব্যাপক হত্যাকান্ড সংঘটনের পথ তৈরি করে দেয়।[২৬] অপরাধীরা এমনভাবে গড়ে ওঠে যে, তারা সত্যিকারভাবেই বিশ্বাস করে যে, তারা সমাজের জন্য সর্বোত্তম কাজটি করছে। এটা ঘটে ঐ লোকদের নির্মূলীকরণের মাধ্যমে যাদেরকে মানুষ থেকে নিম্নপর্যায়ের জীব মনে করা হয়, যারা সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

এই রিপোর্টে ব্যবহৃত গবেষণাসমূহ গ্রেগরি এইচ স্টানটন[২৭] ও বারবারা হার্ফ এবং টেড রর্বাট গার[২৮] এর শক্তিশালী কার্যক্রমকে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করে দেয়। তথ্যগুলো জেনোসাইডের ধাপগুলোর বিরুদ্ধে একেকটি সতর্কবার্তা, যেগুলোর বিবরণ দেওয়া হয়েছে ড্যানিয়েল ফায়ারস্টাইন[২৯] এর গবেষণায়। নিচের টেবিলটি ফায়ারস্টাইন-এর periodization of the genocidal process বা জেনোসাইডের পদক্ষেপের সময় নিরোপন ও ধাপ সংযোজন করা হয়েছে। যেখানে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে ছয়টি অপরিহার্য ধাপ হিসেবে। এই ধাপগুলো অপরিহার্য মাত্রার সীমারেখা নয় এবং বার বার এগুলোর অতিক্রম করাও আবশ্যক নয়।

ফায়ারস্টাইনের ব্যাখ্যাকৃত জেনোসাইডের স্তর (যা ISCI গ্রহণ করেছে)		
	জেনোসাইডের স্তর	বিস্তারিত
১	স্টিগমাটাইজেশন (Stigmatisation)	কলঙ্ক লেপন, অপবাদ দেওয়া। ডিহিউম্যানাইজেশন ও বলির পাঠা বানানোসহ নাগরিকত্ব অস্বীকারের মাধ্যমে 'নেতিবাচক ভিন্নতা'র সৃষ্টি করা।
২	হয়রানি, সহিংসতা ও সন্ত্রাস (Harassment, Violence and Terror)	শারীরিক ও মানসিকভাবে হয়রানি, ভায়োল্যান্স, বিধিবহির্ভূত গ্রেফতার ও আটক, ভোটদানের অধিকার ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।
৩	আইসোলেইশন ও পৃথক্করণ (Isolation and segregation)	জোরপূর্বক সামাজিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মতার্দশের স্থান থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন করা। যাতে পূর্বের বৃহৎ কমিউনিটির সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা যায়।

৪	সিস্টেমেটিক দুর্বলীকরণ (Systematic weakening)	এর মধ্যকার স্ট্রাটেজির মধ্যে রয়েছে টার্গেট গ্রুপকে এক জায়গায় ঠেসে জড়ো করা, অপুষ্টি, মহামারী, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা, নির্যাতন ও বিক্ষিপ্তভাবে হত্যার মাধ্যমে শারীরিকভাবে ধ্বংস করা এবং ক্রমাগত উৎপীড়ন, অপমান, অবমাননা, গালাগালি ও পরস্পরিক সৌহার্দ্য ভেঙে দিয়ে মানসিকভাবে ধ্বংস করা।
৫	Extermination (মূলোৎপাটন)	গণহত্যার মাধ্যমে তাদেরকে সংগঠিত আকারে শারীরিকভাবে নির্মূল করে দেওয়া, যারা এক সময় নির্দিষ্ট ধরণের সামাজিক সম্পর্কে জড়িত ছিল।
৬	Symbolic Enactment (সিম্বলিক এনাক্টমেন্ট)	নতুন একটি সমাজের পুনর্গঠন, যেখানে জেনোসাইডের ভিকটিম শারীরিক ও প্রতীকীভাবে 'বিলীন' হয়ে গেছে।

বর্ণিত ধাপগুলোর আলোকে সামাজিক সম্পর্ক গঠন, ধ্বংস ও পুনর্গঠন ততক্ষণ পর্যন্ত হতে থাকে যতক্ষণ না ভিকটিম গ্রুপের 'প্রতীকী ধ্বংস' সম্পন্ন হয়। আর রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে এর মানে হল শারীরিক ও প্রতীকীভাবে মায়ানমার থেকে তাদেরকে নিশ্চিন্ন করে দেয়া।

আইএসসিআই (ISCI) এর তথ্য জোরালোভাবে ধারণা দিচ্ছে যে, আমরা এখন ফায়ারস্টাইনের জেনোসাইডের চতুর্থ ধাপ উইটনেস করছি। ব্যাপক গণহত্যার ঠিক পূর্বের ধাপ।

মেথোডলোজি

এই রিপোর্টটি বার মাসের গবেষণার ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে। যার ফান্ড যোগান দিয়েছে ইউকে ইকোনোমিকস এন্ড সোস্যাল রিসার্চ কাউন্সিল, তার 'পাইলট আর্জেন্সি গ্রান্টস ম্যাকানিজম' প্রজেক্টের অধীনে। তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রফেসর পেনি গ্রীন (Director of ISCI and Chair in Law and Globalisation at Queen Mary University of London), আইএসসিআই (ISCI)। তিন সদস্য বিশিষ্ট টিম লন্ডনের কুইন ম্যারি ইউনির্ভাসিটির গবেষকরা (গ্রীন, থমাস ম্যাকম্যানাস এবং এলিসিয়া ডিলা কোর

ভ্যানিং) চার মাসের বেশি সময় মাঠ পর্যায়ে অতিবাহিত করেছেন (প্রাথমিক পর্যায়ে মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ছিলেন, এছাড়া ইয়াঙ্গুনেও ছিলেন)। তারা সেখানে রোহিঙ্গাদের উপর মায়ানমার সরকারের চালানো নির্যাতন জেনোসাইড কি না, তার অনুসন্ধান চালান।

মুখ্য ব্যক্তিদের (অংশগ্রহণকারীদের) সাথে এই টিম ১৭৬ টি আনুষ্ঠানিক ইন্টারভিউ[৩০] পরিচালনা করেছে। এর মধ্যে রয়েছেন এমন ব্যক্তি, যাদেরকে শনাক্ত করা গেছে রোহিঙ্গা, রাখাইন, কামান, বামার এবং মারামাগয়ী আদিবাসী;[৩১] INGO স্টাফ; রাখাইন রাজ্যের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ; রাখাইন সিভিল সোসাইটি লিডার ও রাজনীতিবিদ; রাখাইন ও রোহিঙ্গা এক্টিভিস্ট; সিনিয়র বিদেশী কূটনীতিবিদ; লোকাল ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের সাংবাদিকবৃন্দ; আইনজীবী; বৌদ্ধ ভিক্ষু; ইমাম; ব্যবসায়ী; স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক ফটো সাংবাদিক; এবং শিক্ষাবিদ।[৩২]

মাঠ পর্যায়ের কাজের মধ্যে আরো রয়েছে এ্যাথনোগ্রাফিক পর্যবেক্ষণ। প্রায় চল্লিশটি রোহিঙ্গা, কামান ও রাখাইন গ্রাম এবং IDP এর ক্যাম্পসমূহ (যা সিতওয়ে, থান্ডওয়া ও ম্রাউক ইউ জেলায় অবস্থিত), এবং সিতওয়ের অং মিংগলার বস্তিতে এ্যাথনোগ্রাফিক পর্যবেক্ষণ। মাঠ পর্যায়ের এই কাজের মধ্যে রয়েছে পর্যবেক্ষণসহ ইন্টারভিউ, যা রাখাইন রাজ্যের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণ করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল।

ইন্টারভিউগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে ভিকটিম ও জেনোসাইড পরিচালনাকারী উভয় সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা ও চেতনা প্রকাশ পায় এবং তা গণহত্যামূলক নির্যাতনের প্রমাণাদী সংরক্ষণ করে। একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যকার অসন্তোষ অনুধাবন করতে পারা, যা তাদেরকে চালিত করেছে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে। আমাদের নেয়া সাক্ষাতকারের অনেকেই তাদের দীর্ঘদিনের প্রতিবেশিদের বিরুদ্ধে ২০১২ সালের সহিংসতায় জড়িত ছিল। ঐ প্রদেশে বৌদ্ধ ও মুসলিমদের মধ্যকার অন্তর্নিহিত উত্তেজনা ও বিদ্বেষ বুঝতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাখাইনরা নিজেদের নিরাপত্তাহীন মনে করার কারণ বুঝতে পারা, যা জাতীয়তাবাদী ও বর্ণবাদী চিন্তাধারার ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

রোহিঙ্গা, রাখাইন ও কামান গ্রামগুলোতে প্রথম দিকের ইন্টারভিউগুলো স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পন্ন হয়। সরকার অনুমোদিত বা অননুমোদিত গ্রাম পরিচালকের অনুমতি সাপেক্ষেই তা করা হয়। যারা গ্রামের অধিবাসীদের সাক্ষাতকার নেয়ার অনুমতি মঞ্জুর করেছিলেন, তারা গ্রাম সম্পর্ক প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করেন। অর্ধনির্মিত ভাঙ্গা প্রকৃতির ক্যাম্পগুলোতে প্রবেশের সাথে সাথেই ইন্টারভিউ শুরু

হয়ে যেত। আর গবেষকরা বিক্ষিপ্তভাবে তাদেরকেই বাছাই করতেন যারা কথা বলতে আগ্রহী ছিল। ক্যাম্পে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় কথা বলায় বেশি সংযত ছিলেন, তবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে মহিলাদের কাছ থেকে তাদের বক্তব্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

আইএসসিআই এর গবেষকরা দুইবার বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রথমবার একটি রাখাইন ক্যাম্পে সাক্ষাতকার চলাকালে একদল বয়স্ক লোকের সাথে, যারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল রোহিঙ্গাদের পক্ষ নিয়ে তাদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ এনে; আরেকবার হয়েছিল একটি রাখাইন গ্রামে, যখন ২০১২ সালের সহিংসতায় অংশ নেয়া দু'জন অপরাধীর সাক্ষাতকার নেয়া হচ্ছিল, তখন একজন বয়স্ক ব্যক্তি গবেষকদের এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেয়। প্রত্যেকটি কেইসে বিদিত সম্মতি নিশ্চিত করা হয়েছে এবং গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ ইন্টারভিউতে নাম প্রকাশ করা হয়নি তাদের পরিচয় রক্ষা ও নিরাপত্তার খাতিরে।

মাঠ পর্যায়ের গবেষণাটি বৃটিশ ও বার্মিজ আর্কাইভসে দালিলিক অনুসন্ধান, মিডিয়া তথ্যানুসন্ধান ও একাডেমিক গবেষণা নিরীক্ষণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া আল জাযিরা, উইকিলিকস, সাংবাদিক ফ্রান্সিস ওয়েড ও ফর্টিফাই রাইটস-এর দ্বারা ফাঁসকৃত তথ্য-ডকুমেন্ট ও ইন্টার্ভিউও হুবহু রেফারেন্স হিসেবে নেয়া হয়েছে। আইএসসিআই-এর গবেষকরা যখন উত্তর রাখাইন রাজ্যে যাওয়ার জন্য অনুমোদন নেয়ার চেষ্টা চালান, তখন অনুমতি দেয়া হয়নি। কেন অনুমতি দেওয়া হয়নি, এই প্রসঙ্গটির আলোচনার একটি অনুবাদ করে দেখা যায়, গবেষক দলকে এই কারণে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি যে, তারা সেখানে নিশ্চিতভাবে 'কালার'দের সাথে কথা বলবেন (এটা একটা অমর্যাদাকর পরিভাষা যা মুসলিমদের জন্য ব্যবহার করা হয়)। যদিও অফিসিয়ালি বলা হয়েছে, গবেষক টিমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না– এ জন্য অনুমতি দেয়া হয়নি। ফলে আইএসসিআই উত্তর রাখাইন সম্পর্কে যা জানতে পেরেছে, তার অধিকাংশই এসেছে রোহিঙ্গাদের বক্তব্য থেকে, যারা সেখান থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে।

আইএসসিআই-এর মতে এই রিপোর্টের জন্য একত্রিত তথ্যগুলো গভীরতায়, ব্যাপ্তিতে ও গঠনবিন্যাসে অদ্বিতীয়। এবং রাখাইন রাজ্যের জেনোসাইডের প্রশ্নে এই গবেষণা মাঠপর্যায়ে করা একমাত্র সিস্টেম্যাটিক প্রাতিষ্ঠানিক কাজ হিসেবে উপস্থাপিত। এ ছাড়া এই গবেষণাটি একটি শক্তিশালী দালিলিক উৎস উপস্থাপন করেছে, বিষয়টা বুঝতে যে, আসলে রোহিঙ্গাদের সাথে কী হচ্ছে এবং তা জেনোসাইড কি না সেই সিদ্ধান্তে আসতে।

থাণ্ডউইর নিকটস্থ সমুদ্র সৈকতে রাখাইন জেলেরা।

২. পটভূমি

রাখাইন রাজ্য

রাখাইন রাজ্য মায়ানমারের উত্তরাংশের উপকূলীয় তটরেখা ও বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ৫৬০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। এটা মায়ানমারের মধ্যাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন, ইউমা পর্বতমালার পাশে একটি নিচু ভূখণ্ড।

রাখাইন স্টেইটের জনসংখ্যা প্রায় ৩ দশমিক ২ মিলিয়ন।[৩৩] এর মধ্যে রাখাইন বৌদ্ধ হল ২ দশমিক ১ মিলিয়ন এবং মুসলিম রোহিঙ্গা এক মিলিয়ন থেকে কিছু বেশি।[৩৪] রোহিঙ্গাদের সঠিক হিসাব বের করা কঠিন। কেননা ২০১৪ সালের আদমশুমারিতে অংশগ্রহণ করা থেকে তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, যদি না তারা 'বাঙালি' হিসাবে রেজিস্ট্রি করে, যা খুব কম রোহিঙ্গাই করেছিল। রাখাইনরা (আরাকানী হিসাবেও পরিচিত) নিজেরাও মায়ানমারের একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। রাষ্ট্রের মূল জনসংখ্যার প্রায় ৬% ভাগ।

অধিকাংশ রোহিঙ্গারা উত্তর রাখাইন রাজ্যের মংডু এবং বুথিডং জেলায় (township)[৩৫] বাস করে। তারাই এ সমস্ত এলাকার বৃহৎ জনগোষ্ঠী। এ ছাড়া

রাখাইন রাজ্য স্বল্পসংখ্যক চিন, কামান, ম্রো, খামি, ডাইনেট এবং মারামাগয়ী জাতিগোষ্ঠীরও আবাসস্থল।

মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের এ্যাথনিসিটির বিদ্যমানতা ও আদিবাস নিয়ে পরস্পর বিরোধী ইতিহাস আছে। কার্লোস সারদিনা গ্যালাস বিবরণ দিয়েছেন :

বার্মিজ ও রাখাইন জাতীয়তাবাদীরা প্রায়ই রোহিঙ্গাদের উপর ইতিহাস পরিবর্তনের অভিযোগ আনে এই বলে যে, এটা তাদের জাতীয়তা দাবির প্রথম পদক্ষেপ; অন্যদিকে রোহিঙ্গা ঐতিহাসিকরা কলোনিয়াল সময়কালে বাংলাদেশ থেকে আরাকানে মাইগ্রেট হওয়া শ্রমিকদের ব্যাপারটা ছোট করে দেখতে চায় অথবা অস্বীকার করে।[৩৬]

তবে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা রাখাইন রাজ্যে মুসলিমদের দীর্ঘকাল বসবাসের তথ্য প্রদান করেন। যার পক্ষে প্রাচীন মসজিদ ও মুদ্রার ব্যবহার এবং আরাকান শাসকদের ইসলামিক উপাধি গ্রহণ সাক্ষ্য প্রদান করে। 'রোহিঙ্গা' পরিভাষার উৎপত্তি কোথায় সেটা পরিষ্কার নয়, কিন্তু ফ্যাক্ট হল ১৯৫০ সালের দিকে রোহিঙ্গা ও তাদের জাতিগোষ্ঠীর উপাধী বার্মিজ রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বার্মার প্রথম রাষ্ট্রপতি সাও শাই থাইকে যিনি একজন শান ১৯৫৯ সালে দাবি করেন, 'আরাকানের মুসলমানরা নিশ্চিতভাবে বার্মার আদিবাসী জাতীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যদি তারা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত না হয় তবে আমাদেরকেও বার্মার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।'[৩৭]

স্বাধীনতা-পরবর্তী বার্মার প্রথম প্রাইম মিনিস্টার ইউ নু এর অধীনে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব কার্ড ইস্যু করা হয়েছিল, এবং তাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল। তখন রোহিঙ্গারা সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিল। ১৯৬০ সালের দিকে বার্মার সরকারি রেডিও সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে সপ্তাহে তিন দিন রোহিঙ্গা ভাষায় প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। এটা ছিল সংখ্যালঘু ভাষায় প্রোগ্রাম পরিচালনার আওতায়। এবং 'রোহিঙ্গা' পরিভাষাটি ১৯৭০ সালের শেষ দিক পর্যন্ত পত্রিকা ও স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।[৩৮]

বৃটিশ উপনিবেশের সময়কালে যখন ইন্ডিয়া ও বার্মা এক সাথে শাসিত হচ্ছিল, তখন বৃটিশরা ধান চাষের ইচ্ছে করলে ইন্ডিয়ার সংখ্যাগুরু মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্য বেঙ্গল থেকে বার্মায় (প্রধানত আরাকান রাজ্যে) অভিবাসন বৃদ্ধি পায়। এসব সাময়িক অভিবাসীর অনেকেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে তা পূর্ব থেকে সেখানে বসবাসকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। বৃটিশ পরবর্তী সময়েও আরো অভিবাসন সংঘঠিত হয়েছে বর্তমানকালের মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায়। রাখাইনরাও বাংলাদেশে মাইগ্রেট করেছে।[৩৯] যা সীমান্ত এলাকার একটা সাধারণ প্রতিচ্ছবি এবং বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যকার এই

ইমিগ্রেশন পরিকল্পিত ছিল না।

আসল ইতিহাস যাই হোক, মায়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আদিবাস নিয়ে তোলা ইস্যুকে ব্যবহার করা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের উপর চালানো রাষ্ট্রের অনস্বীকার্য ও সিস্টেম্যাটিক নিপীড়ন থেকে মানুষের দৃষ্টিকে সরিয়ে দিতে।

আইএসসিআই-এর মাঠপর্যায়ের কাজ উদঘাটন করেছে রাখাইন জনগোষ্ঠীর কয়েকটি দলের ভেতরকার বিরাজমান কিছু ঘৃণার স্মৃতি, যা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে ছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৯৪২-৪৩ সালে উভয় সম্প্রদায়ে সংঘটিত হত্যাকান্ড, যখন রোহিঙ্গারা বৃটিশদের সাথে মিলে আর রাখাইনরা জাপানীদের সাথে মিলে যুদ্ধ করেছিল। এই ঐতিহাসিক ক্ষোভে নতুন করে প্রাণের সঞ্চারণ হয়েছে রাষ্ট্র অনুমোদিত একের পর এক ষড়যন্ত্রের ফলে যা রোহিঙ্গাদের সন্ত্রাসী ও অবৈধ অভিবাসী হিসেবে ব্রান্ড করছে এবং বলছে এরা রাখাইন রাজ্যকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইসলামিক বানাতে চায়। সংখ্যাগুরু 'আদিবাসী' রাখাইন বৌদ্ধ 'আমরা' ও সংখ্যালঘু 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' মুসলিম রোহিঙ্গা 'তারা'[৪০] দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যকার ক্রমবর্ধমান এই মেরুকরণ একটি ভয়াবহ ও ডেঞ্জারাস সামাজিক ভূখন্ড লালন করছে।

রাখাইন নিপীড়ন

মায়ানমারের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী রাখাইনদের উপর মায়ানমার রাষ্ট্রের সুদীর্ঘ নির্যাতনের ইতিহাস রয়েছে। আইএসসিআই-এর সংগৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণাদী এর ইঙ্গিত দেয়। এর মধ্যে রয়েছে চিন্তাধারার দমন, রাখাইন সংস্কৃতি, ভাষা ও ইতিহাসের বহিঃপ্রকাশ ও ব্যবহারের উপর দমনপীড়ন। থান ম্রিন্ট, যিনি একজন রাখাইন বুদ্ধিজীবী এবং আরাকান ন্যাশনাল পার্টির (ANP) একজন রাজনীতিবিদ। তিনি বলেন :

'আমাদের আদিবাসী পরিচিতির উপর অনেক ড্যাঞ্জার রয়েছে। আমাদের এই ভূখন্ড রাখাইন জনগোষ্ঠীসহ একটি অতি প্রাচীন ভূমি। রাখাইন ছাড়া এই এলাকা একটি মৃতপল্লী, একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের ইতিহাস অনেক বড়। মায়ানমারের অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে– স্বল্প কয়েকটি গোষ্ঠী বিলুপ্তও হয়ে গেছে, ফিউ (Pyu) জনগোষ্ঠীর লোকজন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কমতি রয়েছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা এবং অর্থনীতিতে।'[৪১]

আরাকান মায়ানমারের অন্যান্য সংখ্যালঘু-জনবহুল অঞ্চলের মত নয়। ১৭৮৪ সালে বার্মিজদের দখলের পূর্বে, আরাকান ছিল দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি শক্তিশালী

রাষ্ট্রের অন্যতম একটি।[৪২] বৃটিশ শাসনের (১৮২৬-১৯৪৮) সময় এর অধঃপতন ঘটে, যা বার্মিজ মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ এর অধীনে (১৯৬২-২০১০) গতি বৃদ্ধি পায়। রাখাইন বৌদ্ধরা আইএসসিআই-এর কাছে প্রকাশ করেছে অভিজাত বামার শাসকশ্রেণীর নিয়মতান্ত্রিক এবং চলমান নির্যাতনের কথা। অনেকেই মনে করেন নিপীড়করা রাখাইনদের সংস্কৃতি ও পরিচিতি বিলুপ্তির লক্ষ্য নিয়ে এই নিপীড়ন চালাচ্ছে। রাখাইন সংস্কৃতি বিলুপ্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী এক ব্যক্তি বলেন :

'আমরা রাখাইনদের অনেক শত্রু রয়েছে, কিন্তু বার্মিজরা প্রধান শত্রু ...এখানে আমাদের জনগোষ্ঠীর জন্য অনেক অনেক বিপদ রয়েছে, আমাদেরকে অবশ্যই তা প্রতিহত করতে হবে। হিউম্যান রাইটস ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে তো আমরা চিন্তাই করতে পারি না। আমরা সংগ্রাম করে যাচ্ছি যাতে করে আমাদের আইডেন্টিটি ও সমাজ যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায় ...আমাদের কোন ভবিষ্যত নাই, আমরা কোন ভবিষ্যত দেখছি না। আমাদের অবশ্যই আমাদের সম্প্রদায় রক্ষা করতে হবে ...আমরা আমাদের পরিচয়, আমাদের ভাষা, আমাদের জনগোষ্ঠীকে হারানোর ভয়ে আছি ...আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার (federalism) প্রয়োজন।'[৪৩]

কিছু সংখ্যক রাখাইন ইন্টারভিউতে তাদের উপর চালানো নিপীড়নের প্রকৃতিকে 'জেনোসাইড' হিসাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ২০১৫ সালের নৌকা সংকটের সময় ইয়াঙ্গুন প্রদেশের জাতিগত রাখাইন বিষয়ক মন্ত্রী ও এএনপির (ANP) চেয়ারম্যান জ্য আই মং (Zaw Aye Maung) এক আলোচনায় দাবি করেন, যদি রাখাইন অঞ্চলে জেনাসাইড সংঘঠিত হয়ে থাকে, তবে সেটা জাতিগত রাখাইন বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত হচ্ছিল। তিনি বলেন, 'আমরা এখন এই বাংলাদেশীদের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হওয়ার বিপদে আছি'।[৪৪] একই ভাষায় এএনপির একজন মুখপাত্র বলেন, 'আমার মনে হয় রাখাইনরা এই ভূখন্ড থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে, যদি তারা বাঙালিদের নাগরিকত্ব অনুমোদন করে।'[৪৫]

উন্নয়নমূলক ও অর্থনৈতিক অবহেলা, সাথে সাথে ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন এর নেতৃত্বে চালানো মিলিটারী ক্যু[৪৬], এরপর থেকে চলতে থাকা বৈষম্য ও নিপীড়ন রাখাইন রাজ্যে ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার সামাজিক সম্পর্কের মাঝে এক বিধ্বংসী প্রভাব ফেলেছে। দারিদ্র্যের মাত্রা রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ও কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের বিপরীতে বিরাট বৈসাদৃশ্য প্রকাশ করে, যার উভয়টিই বৈদেশিক শক্তির মাধ্যমে মারাত্মকভাবে শোষিত। উদাহরণস্বরূপ রাখাইনে রয়েছে Shwe গ্যাস প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের আওতায় উপকূল থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হয় যা মিলিটারি ও চায়নার জন্য বিশাল অংকের রেভিনিউ এনে দেয়। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও তথ্য বিভাগের একজন ডিরেক্টর